অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৯ ▪ সংখ্যা ১ ▪ জানুয়ারি ২০২০

আলাপ

পদ্মার পাড়ের বিজয়ী নারী আয়েশা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৯। সংখ্যা ১
জানুয়ারি ২০২০

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথী

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

শুরু হলো নতুন বছর ইংরেজি ২০২০ সাল। ইংরেজি বছর আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সাথে মিশে আছে। প্রায় সব কাজই আমরা ইংরেজি সাল অনুসারে করে থাকি। দিনের পর দিন যায়, মাস পার হয়। আসে নতুন বছর। ঠিক এভাবেই আজকের দিনটিও আগামীকাল পুরানো হয়ে যাবে। আর একটি নতুন দিন সেই জায়গা দখল করবে। দিন বদলের এই রীতি মানুষের মনে নিয়ে আসে আনন্দ। আশার আলো ছড়ায়। নতুন আশা নিয়েই নতুন বছরে পা রাখলো আলাপ পত্রিকা। আপনাদের সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এবার আলাপের মূল রচনায় আছে পদ্মার পাড়ের এক সংগ্রামী নারীর কথা। তিনি হলেন মোসা: আয়েশা বেগম। স্বামী সন্তানসহ পদ্মার পাড় ছেড়ে চলে এসেছিলেন একদিন ভিন্ন এলাকায়। প্রবন্ধে জানা যাবে, কীভাবে তিনি জীবন যুদ্ধে জয়ী হলেন। আর কীভাবেই বা ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে নিজ ঠিকানা গড়ে তুললেন। এই সংখ্যায় 'জেনে নিন' বিভাগে আছে পাটালী গুড় তৈরির নিয়ম সম্পর্কে কিছু কথা। 'আমাদের দেশে' বিভাগে পাবেন বনবিবির বটগাছ সম্পর্কে পরিচিতি। অন্যান্য নিয়মিত বিভাগের পাশাপাশি 'আমরা নারীরা' বিভাগে পাবেন আরেকজন অসহায় নারীর সাফল্যের কথা। আসলে আলাপের মূল কাজই হলো কিছু উন্নয়নের কাহিনী সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এই উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার কথা জেনে সবাই উৎসাহিত হবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশাটুকু নিয়েই শুরু হোক নতুন বছরে আলাপের পথচলা। ■

সূচিপত্র

- পদ্মার পাড়ের বিজয়ী নারী আয়েশা ১ - ২
- ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও শীতবস্ত্র বিতরণ ৩
- পাটজাত হস্তশিল্প দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন ৪ - ৫
- ভিক্ষা ছেড়ে স্বাবলম্বী সুখজান বিবি ৬
- আমাদের সংলাপ ৭
- বনবিবির বটগাছের ইতিহাস ৮ - ৯
- অবাক করা দুই উপজাতি ১০ - ১১
- খেজুরের গুড় তৈরি ১২ - ১৩

পদ্মার পাড়ের বিজয়ী নারী আয়েশা

মূল রচনা

আয়েশার গরুর খামার

একটা সময় ছিল, যখন নারী মানেই সমাজ সংসারের বোঝা। ঘরেই শুধু তার কাজ। সে রান্নাবাড়া করবে, বাড়ির সবার যত্নআত্তি করবে আর সংসারের সকল কাজসহ সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করবে। ঘর-বাড়ির মধ্যেই তার সব কিছু সীমাবদ্ধ। আর বাইরের সকল কাজ শুধুই পুরুষের। নারীদেরও যে বাইরে কাজ করার অধিকার আছে- তা কেউ মানতে চাইতো না। তাদেরও যে সামাজিক অধিকার আছে - কেউ বুঝতে চাইতো না।

কিন্তু এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। থেমে নেই আর বাংলার নারীরা। এখন পাল্টে গেছে তাদের জীবনধারা। ঘর সামলানোর পাশাপাশি বাইরের কাজেও তারা সমান পারদর্শী। দারিদ্র্য বিমোচনে নারীরাও এখন পুরুষের সাথে সমানতালে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

এমনই একজন সংগ্রামী নারী হলেন আয়েশা। তার পুরো নাম মোছা: আয়েশা বেগম। স্বামী সন্তানসহ পদ্মার পাড় ছেড়ে চলে এসেছিলেন একদিন ভিন্ন এলাকায়। এরপর ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে তাদের ঠিকানা গড়ে তুললেন। এটা প্রায় আঠার বছর আগের কথা। ছয় সন্তানের জননী এখন আয়েশা। এদের মধ্যে তার এক ছেলে প্রতিবন্ধী। স্বামী আব্দুল বাতেন মিয়া অন্যের কাজ করে সংসার চালাতেন। তাতে খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাতে হতো তাদের। তখন মাথায় চিন্তা আসে আয়েশার। কীভাবে নিজেদেরকে আরও একটু ভালো রাখা যায়! এজন্য কিছু করা দরকার। তারা ভাবলেন, ব্যবসা শুরু করা যায়। কিংবা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা যায়! তারই ধারাবাহিকতায় অর্থের সন্ধানে বের হন এই মধ্যম বয়সী স্বামী-স্ত্রী।

আয়েশার খামারের একাংশের ছবি

সন্ধান পায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের। সেখান থেকেই অল্প কিছু টাকা ঋণ নিয়ে দুইটি গাভী কিনেন তারা। আর এই গাভী দুটো দিয়েই শুরু হয় তাদের উদ্যোগের পথচলা। যে উদ্যোগ চলমান আছে আজ দশটি বছর ধরে।

আজ তাদের খামারে ১২টির মতো গাভী রয়েছে। এখান থেকে তারা প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ লিটার দুধ সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি অন্যত্র থেকে আরো ১৫ লিটারের মত দুধ সংগ্রহ করেন আয়েশা। তারপর বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে। এভাবে সে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই হাজার টাকার মতো আয় হয়। এই দিয়েই এখন চলে তাদের সংসার। পাশাপাশি চলে মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর কিস্তি শোধ। এই আয় দিয়েই আয়েশা চার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এক ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষায় পড়ালেখা শেখাচ্ছেন। প্রতিবন্ধী ছেলের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, টাকা জমিয়ে আয়েশা ধামরাইয়ে দশ শতাংশ জমিও কিনেছেন। সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার স্বপ্নের বাড়ি করার পরিকল্পনা রয়েছে। আয়েশা এবার দশমবারের মতো ডিএফইডি থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন। সে এখন তিনলক্ষ টাকার কিস্তি নিয়মিতভাবে শোধ করছেন। কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে সেরা সদস্যদের মধ্যে আয়েশা এখন অন্যতম। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে, এই সংস্থা থেকে আরও টাকা ঋণ নিয়ে তার খামারটিকে বড় করা।

যে মানুষটি এক সময় ছিল পরনির্ভরশীল, সে এখন হয়েছে আত্মনির্ভরশীল। আয়েশা শুধু স্বপ্ন দেখেই চুপ থাকেননি। বরং তার স্বপ্নকে বাস্তব রুপ দিয়েছেন। আমাদের সাথে আলাপচারিতায় আয়েশা স্মরণ করেন তার সেই শুরুর দিকের কথা। কান্নাভেজা কণ্ঠে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপকারের কথা অকপটে স্বীকার করেন। আয়েশা বলেন, ‘আপনারা আমাকে অর্থ দিয়ে সহায়তা না করলে হয়ত আমার সুদিন আসত না। অন্যের বাড়ি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে বেড়াতে হতো। আপনাদের ঋণ আমি কোনো দিন শোধ করতে পারব না।’

বর্তমান সময়ের একজন বিজয়ী নারী আয়েশা। নারীরাই বদলে দিতে পারে সমাজের নিয়ম। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে গড়ে ওঠা সামাজিক প্রথা ভেঙে সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে। দেশে আনতে পারে উন্নয়নের ছোঁয়া। তাদের দেখে জেগে উঠবে অন্য নারীরাও। তারাও কিছু করার সাহস পাবে। নারী পুরুষের মিলিত চেষ্টায় সংসারের অভাব দূর হবে। তাই বলা যায়, আয়েশারাই হলো সংগ্রামী আর বিজয়ী নারী। তারাই আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিশারী।

সরোয়ার হোসাইন শুভ, ম্যানেজার (শিক্ষানবিস), বাইপাইল ব্রাঞ্চ, ঢাকা এরিয়া, ডিএফইডি, ঢাকা।

ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও শীতবস্ত্র বিতরণ

নোটিশ বোর্ড

সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

'ডিএফইডি'র সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি সব সময়ই অসহায়ের সহায়। এবারও তাদের ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কিছু অসহায় মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাদের উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০১৯ তারিখে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মো: ইমানুর রহমান, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মনোহরদী, নরসিংদী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব, মোল্লা মো: আজগর আলী। তিনি এরিয়া ম্যানেজার, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) নরসিংদী-২ এরিয়া। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভারপ্রাপ্ত কো-অর্ডিনেটর মো: মিজানুর রহমান ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: রবিউল ইসলাম। সাথে ছিলেন প্রবীণদের ইউনিয়ন কমিটির সন্মানিত নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন মো: জাকির হোসেন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা সমৃদ্ধি কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব, ছাদিকুর রহমান শামীম। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মোট ২১৭ জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী নাজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে এই স্বাস্থ্য ক্যাম্পটি পরিচালিত হয়। প্রায় ৮০জন অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণ ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

জেনে নেই

পাটজাত হস্তশিল্প দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন

পাট দিয়ে তৈরিকৃত বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী

হাতের তৈরি শিল্পকেই সাধারণত হস্তশিল্প বলা হয়। নিজে এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে এগুলো তৈরি হয়। সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে অনায়াসেই বানিয়ে ফেলা যায় এসব পণ্য। আর যেসব পণ্য পাট দিয়ে তৈরি হয়, তাকে বলে পাটজাত হস্তশিল্প। যেমন- ব্যাগ, ম্যাট, কলমদানী, পাপোশ ইত্যাদি।

পাটজাত হস্তশিল্প তৈরির সুবিধা

বাংলাদেশ সোনালি আঁশের দেশ। সোনালি আঁশ বলতে পাটের আঁশকে বুঝায়। এদেশের পাটের মান অন্যান্য দেশের চেয়ে উন্নত। আর দেশের প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। তাই পাট থেকে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরি করা যেতে পারে, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন শৌখিন পণ্যও তৈরি করা যেতে পারে। আমরা জানি পাট থেকে সাধারণত চট তৈরি করা হয়। এই চট বিভিন্ন আকৃতিতে কেটে নিয়েও কিন্তু হস্তশিল্প তৈরি করা যায়। তবে এজন্য সেলাই ও নকশা করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হয়। এসব পণ্যের বিদেশেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

বাজার সম্ভাবনা

পাট দিয়ে নানান ধরনের সৌখিন পণ্য তৈরি করা যেতে পারে। এসব পণ্যের চাহিদা গ্রামের তুলনায় শহরেই বেশি দেখা যায়। বাজারজাত করতে হলে পণ্যের প্রচার দরকার। এজন্য প্রথমে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিক্রি শুরু করা যেতে পারে। তাহলে ঘরে বসেই এ ব্যবসা

শুরু করা যায়। আবার বিভিন্ন মেলায় বা দোকানে পাইকারী বা খুচরা মূল্যে বিক্রি করা যেতে পারে। এছাড়া নিজেও একটি দোকান করা যেতে পারে। পাট দিয়ে তৈরি সৌখিন পণ্য দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা যেতে পারে।

মূলধন

আনুমানিক ৪ থেকে ৬ হাজার টাকার স্থায়ী উপকরণ হলেই কাজ শুরু করা যায়। পাশাপাশি ৫০০-৬০০ টাকার কাঁচামাল কিনতে হতে পারে। পাটজাত হস্তশিল্পের ব্যবসা শুরু করতে নিজের কাছে প্রয়োজনীয় পুঁজি নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মিশনের 'ডিএফইডি'র মতো স্থানীয় ঋণদানকারী সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও নানান রকম ব্যাংক, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের কাছ থেকে স্বল্পসুদে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী

পাট দিয়ে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী তৈরির আগে এর ওপর প্রশিক্ষণ থাকা ভালো। ভালো কাজ শেখার জন্যই এ প্রশিক্ষণ। এজন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) আছে। এর স্থানীয় নকশা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানে তিন মাস মেয়াদী কোর্স চালু আছে। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন এনজিও এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কারুশিল্পের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মেলার আয়োজন হয়। যেমন- ত্রৈমাসিক মেলা, বৈশাখী মেলা, অন্যান্য জাতীয় দিবস ইত্যাদি। মেলার স্থায়ীত্ব ৩ দিন অথবা ৫ দিন অথবা ১০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্য্যকৃত মূল্যে এই সব মেলার স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। চাইলে এসব মেলায় পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়। এতে বাজারজাত করতে সুবিধা হয়।

কীভাবে বাজারজাত করবেন

পাট জাতীয় পণ্যের দেশে-বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। পাটের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্পের উপর নকশা করলে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে তা যে কারও কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। পণ্য বানিয়ে প্রথমে প্রতিবেশীদের মাঝে বিক্রি করুন। এরপর স্থানীয় শপিং সেন্টারগুলোতে কম দামে সরবরাহ করুন। এছাড়া ই-কমার্স করে অনলাইনে বিক্রি করেও ভালো আয় করতে পারেন। প্রথম দিকে বিক্রি কম হতে পারে। তবে ঠিকমতো পণ্য সরবরাহ করতে পারলে কয়েক মাস পর ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। মার্কেটে মোটামুটি অবস্থান তৈরি হলে পুঁজি বাড়িয়ে ব্যবসা আরও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

লুৎফুন নাহার তিথি,ছবি ও তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

আমরা নারীরা

ভিক্ষা ছেড়ে স্বাবলম্বী সুখজান বিবি

আমার নাম সুখজান বিবি। আমার স্বামীর নাম গোলাম মোস্তফা। তিনি মারা যাবার পর আমার ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বসত ভিটা ছাড়া কোনো জমি ছিল না আমার স্বামীর। অভাব অনটনের সংসার। নিজের কোনো সন্তানও নেই। সতীনের একটা ছেলে আছে, সে আমায় খেতে পরতে দেয় না। নিরুপায় হয়েই আমি ভিক্ষার পথ বেছে নেই।

২০১৩ সাল থেকে ভিক্ষা করি আমি। এক পর্যায়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহায়তা পাই। তারা ভিক্ষুক পূর্নবাসনের মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা অনুদান দেয় আমায়। সেই টাকা দিয়েই কাঁচামালের ব্যবসা শুরু করি আমি। প্রথমে আমাদের বাড়ির সামনে একটি সাইক্লোন সেল্টারে বিক্রি শুরু করি। ব্যবসায়ের কাঁচামাল আমি প্রতিদিন সকালে কলারোয়া কাঁচাবাজার থেকে সংগ্রহ করতাম। এক পর্যায়ে আমি সাইক্লোন সেল্টারে না বসে নিজেই একটা দোকান দিই। গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর আমি আমার দোকানের একটা হালখাতা

সুখজান বিবির দোকান

অনুষ্ঠানও করেছি। এখন আমার আর অভাব নাই। ভিক্ষা তো করিই না, বরং পারলে অসহায়দের সাহায্য করি। বাকিতে মালপত্র দিই। সব মিলিয়ে আগের চেয়ে আমি এখন অনেক ভালো আছি।

মো: অলিয়ার রহমান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি, কলারোয়া ব্রাঞ্চ/৫৪, সাতক্ষিরা-০২ এরিয়া

আমাদের সংলাপ

আসমা বেগম
স্বামী: মো: জয়নাল
সদস্য নং- ০১
দলের নাম: তাওহিদ/২২
ডিএফইডি, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

প্রশ্ন: আমি হাঁস মুরগি পালন করি। আমি বাণিজ্যিকভাবে টার্কি মুরগির ফার্ম করতে চাই। ডিএফইডি আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর: ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম থেকে আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন–

১. আর্থিক সহায়তা
২. কারিগরি সহায়তা
৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা
৪. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. বাজারজাতকরণে সহায়তা

১.আর্থিক সহায়তা: আপনি যদি টার্কি মুরগির ফার্ম করতে চান, তাহলে ডিএফইডি আপনাকে সহায়তা করবে। এজন্য সহজ শর্তে ইসলামী শরীয়াহ্ভিত্তিতে শান্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থায়ন করবে। এক্ষেত্রে আপনি বিনিয়োগ গ্রহণ করে মূলধন বাড়াতে পারেন। পাশাপাশি ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন।

২. কারিগরি সহায়তা: টার্কি মুরগির ফার্ম করার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও অন্যান্য উপকরণ কেনার বিষয়ে সহায়তা করতে পারবে। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানসহ নানান ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে।

৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা: ডিএফইডি আপনাকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ দেবে। প্রকল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবে।

৪. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা: ডিএফইডি আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও সহায়তা করবে। এজন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিবে। এসব প্রশিক্ষণের ফলে আপনার কাজের মান বৃদ্ধি পাবে।

৫. বাজারজাতকরণে সহায়তা: বিভিন্ন হোটেলের বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে বাজারজাতকরণে সাহায্য করবে।

উত্তরদাতা:
মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক, ফতুল্লা ব্রাঞ্চ, ডিএফইডি, নারায়ণগঞ্জ

আমাদের দেশে

বনবিবির বটগাছের ইতিহাস

সুইতলা-মল্লিকপুকুরের বটগাছ

ঐতিহাসিক বনবিবির বট গাছ দেখতে হলে, আপনাকে দেবহাটা যেতে হবে। এজন্য যশোর থেকে সড়ক পথে সাতক্ষীরা সদর বাস টার্মিনালে আসতে হবে। সাতক্ষীরা শহর থেকে কালিগঞ্জ-শ্যামনগর রোডে ২০ কিলোমিটার এলেই সখীপুর মোড়। এখানেই নামতে হবে। সখীপুর মোড় হতে ডান দিকে এগুতে হবে। ৫ কিলোমিটার এলেই দেবহাটা উপজেলা পরিষদ। দেবহাটা উপজেলা পরিষদের কাছে আছে হাজার বছরের পুরাতন এক বটবৃক্ষ। এই স্থানটি দেবহাটার বটতলা নামে পরিচিত। এর আসল নাম হলো বনবিবির বটতলা। প্রায় ১১৬ শতক অর্থাৎ সাড়ে তিন বিঘা জমির উপর বিস্তার করে আছে এই বটগাছ। গাছটির মূল গোড়া আসলে কোনটি তা খুঁজে পাবেন না। কেননা বট গাছের শাখা-প্রশাখা এবং ঝুরি বিরাট রূপ ধারণ করেছে। প্রচলিত ইতিহাস থেকে জানা যায়- এই এলাকায় ব্রিটিশ আমলে জমিদারদের বসবাস ছিল। উপজেলা সদর থেকে টাউনশ্রীপুর পযর্ন্ত তিন কিলোমিটারের মধ্যে ১৮ জন জমিদারের বসবাস ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, এই টাউনশ্রীপুর বাংলাদেশের দ্বিতীয় পৌরসভা। যার নাম ছিলো টাউনশ্রীপুর মিউনিসিপ্যালিটি। কেউ কেউ বলেন বটগাছটি সেই সময়ের। আবার অনেকের ধারণা, ব্রিটিশ আমলেরও বহু আগে এই বটগাছের জন্ম। কিন্তু কীভাবে গাছটির জন্মতা আজও অজানা।’

বিশাল এই গাছ নিয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এর একটি হলো- যিনি এই গাছের ডাল কাটবেন, তিনি বিপদে পড়বেন। তাই দীর্ঘদিন কেউ ডাল না কাটায়, বেড়েছে এর আকার-আয়তন। জানা যায়, কয়েক'শ বছর আগে এখানে জঙ্গল ছিল। বনে যাওয়ার আগে এখানে বনবিবিকে স্মরণ করত সবাই। সেই থেকেই বনবিবির বটতলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে জায়গাটি। অনেকেরই বিশ্বাস, বনবিবিকে স্মরণ করে বনে গেলে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারো মতে হাজার বছরের পুরানো গাছ এটি। অতীতে সাধু সন্যাসীরা এখানে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, দেব-দেবীর পূজা করতেন। কথিত আছে, তিনশ বছর আগে জমিদার ফনীভূষণ গাছটিকে দেবী জ্ঞান করতেন। তিনিই এর নাম রাখেন বনবিবির বটগাছ। আর তখন থেকেই শুরু হয় এর পূজা।

আবার অনেকেই আশা পূরণের জন্য বনবিবিকে মনের কথা শোনাতেন। তবে কালের পরিবর্তনে এখন বটগাছের নীচে আর কোনো সাধু সন্যাসী বসে না। শুধুমাত্র প্রতিদিন বিনোদনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারী ও পুরুষ বেড়াতে আসে। এ ছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রতি বছর এই স্থানে জমে ওঠে বৈশাখী মেলা। স্থানীয় জনসাধারনের উদ্যোগে প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষ দিন এখানে 'হাজত' নামের মেলা বসে। এছাড়া এখানে শঙ্খচিল সিনেমার একটি দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। গাছের আশপাশে এখন জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এতে সৌন্দর্য হারাচ্ছে বনবিবির বটগাছ। তাই স্থানীয়দের দাবি, এই ঐতিহ্যবাহী স্থানটিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

বট গাছের ঝুরিগুলো মাটিতে শিকড়ের মতো ছড়িয়ে আছে

মো: আক্তারুজ্জামান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি, হাদিপুর, সাতক্ষীরা -০১

আজব খবর

অবাক করা দুই উপজাতি

আমাদের পৃথিবীতে আছে নানান রকমের মানুষ। তাদের জীবনযাত্রা, খাওয়া দাওয়া, আচার অনুষ্ঠান, সাজগোজ আমাদের চেয়ে একদম আলাদা। আমরা যা দেখলে বা শুনলে অবাক হই। আজ আমরা এমনই অবাক করা দুই উপজাতি সম্পর্কে জানব। জানব কোথায় তারা বাস করে, কেমনই বা তাদের জীবনযাত্রা।

'সুর্মা' উপজাতি

সুর্মা নারীর ঠোঁটে থালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

'ইথিওপিয়া' হলো একটি দেশের নাম। এই দেশেই বাস করে 'সুর্মা' উপজাতি। তারা অবশ্য বাস করে ইথিওপিয়ায় পশ্চিম দিকে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের চেনা যায় তাদের অদ্ভুত সব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। এসব বৈশিষ্ট্য কিন্তু তাদের জন্মগত নয়। কৃত্রিমভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের অদ্ভুতভাবে সাজায়। নিজেরাই শরীরের বিভিন্ন অংশ বিকৃত করে। সেই সাথে শরীরে বিভিন্ন রকমের রঙ দিয়ে নকশা আঁকে। সাধারণ মানুষদের থেকে যা তাদের আলাদা করে তোলে। সুর্মা মেয়েরা বয়োঃসন্ধিতে পৌঁছালে তাদের নিচের পাটির সব দাঁত ফেলে দেওয়া হয়। এরপর নিচের ঠোঁটটি ছিদ্র করা হয়। সেখানে একটি থালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাদের নিয়ম অনুসারে যার থালা যত বড়, সে তত সুন্দর! থালাটির উপর অনেক নকশা করা থাকে। তবে বর্তমানে সুর্মা গোত্রের অনেক মেয়ে এই ঐতিহ্য আর পালন করে না।

বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গম পাহাড়ে বাস করতেই বেশি পছন্দ করে তারা। আশপাশের গোত্রের সাথে সারাক্ষণ সুর্মাদের লড়াই লেগেই থাকে। লড়াইটাও যেন অনেকটা ঐতিহ্যগত বিষয় তাদের জন্য। তবে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে পার্থক্য হলো, এরা এখন আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে। সভ্যতার আর কিছু গ্রহণ না করলেও, রাইফেলসহ নানান রকম বন্দুক ব্যবহার করছে তারা। সুর্মারা মূলত কৃষিকাজ করেই জীবন ধারণ করে থাকে। তামাক, কফি এবং বিভিন্ন জাতের কপি চাষ করে থাকে তারা। বিভিন্ন গোত্রের সাথে বিনিময় করে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে তারা। সিংহের চামড়া, জিরাফের লেজ, হাতির দাঁতের বিনিময়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে।

জারোয়া উপজাতি

জারোয়া নারীরা নিজেদের প্রথা অনুসারে সেজেছে

বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। এ দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে ৫৭২টি দ্বীপ। দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশের জঙ্গলে বাস করে কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়। এদেরই একটি জারোয়া। এটিও একটি ক্ষুদ্র জাতি। জারোয়া উপজাতিরা বাস করে জঙ্গলে। এদের সমাজব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা একদম আদিম যুগের মতো। এখনও তারা উলঙ্গ বা আধা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। জারোয়ারা কথা বলে জারোয়া ভাষায়। এ ভাষার কোনো হরফ নেই। জারোয়াদের প্রধান খাদ্য জঙ্গলের জীবজন্তু, ফলমূল আর সাগরের মাছ। তীর - ধনুক দিয়ে এরা শূকরসহ নানান জীবজন্তু মাছ শিকার করে। এদের খাদ্য তালিকায় মধুও আছে। মধু সংগ্রহে এরা অনেক দক্ষ। জারোয়াদের গায়ের রঙ কালো। এরা এক ধরনের যাযাবর। খাদ্য সংগ্রহ ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই এটা করে তারা। জারোয়াদের বসবাস আন্দামান দক্ষিণ-পূর্বের দ্বীপে। জারোয়ারা তাদের এলাকায় বাইরের মানুষের আসা একদম পছন্দ করে না। কৌতুহলে কেউ ঢুকে পড়লে বিষমাখা তীর ছুড়ে হত্যা করতেও পিছপা হয় না তারা। ভারত সরকার এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। তাই অনেক ঝামেলা হলেও জারোয়া এলাকায় যাওয়ার জন্য একটি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ভারতসহ বাইরের দুনিয়ার মানুষের ওখানে যাবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এতে ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশি। বাইরের মানুষ যাওয়ার ফলে জারোয়া জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। তাদের ভিতর বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়ে। আগে যা কখনও ছিল না। এসব রোগ - শোক তাদের অবস্থা কাহিল করে ফেলে। বর্তমানে তাই জারোয়াদের সুরক্ষায় এদের এলাকায় পর্যটক ও বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার মানে জারোয়াদের আবাসভূমিকে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে।

এই ছিল ২টি উপজাতি নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন। ভালো লাগলে আমরা আরও কিছু উপজাতির অজানা তথ্য নিয়ে হাজির হবো।

লুৎফুন নাহার তিথি, ছবি ও সূত্র: ইন্টারনেট

আমাদের কাজ

খেজুরের গুড় তৈরি

পাড়া-গাঁয়ের মানুষের হাত ধরেই এখনো টিকে আছে খেজুর গুড়

ঐতিহ্যবাহী যশোরের খেজুর গুড়ের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু কীভাবে এই সুগন্ধি গুড় তৈরি হয় তা আমরা জানি কি? কতটা পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে গুড় তৈরির পিছনে, তা কিন্তু আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আসুন জেনে নিই গুড় তৈরির পিছনের কথা। এ সম্পর্কে জানতে হলে যেতে হবে যশোরের 'বেতাল পাড়া' গ্রামে। এই গ্রামে শীতের সময় গাছিরা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহে ব্যস্ত সময় কাটায়। তাদের কাছেই জানতে পারি খেজুর গুড় তৈরির সঠিক নিয়ম। সূর্যের আলো যখন নিভু নিভু তখন গাছিরা কাজে নেমে পড়েন। কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে দা নিয়ে গাছের উপরে উঠেন। দা দিয়ে খেজুর গাছ চাঁচা-ছোলা করে নল বসিয়ে দেন। এরপর কলস বেঁধে দেওয়া হয়। পরের দিন সূর্য ওঠার আগে গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন তারা।

তবে রস সংগ্রহের জন্য সুস্থ ও সবল গাছ নির্বাচন করতে হয়। এসব গাছে বেশি রস পাওয়া যায়। আর গাছের বয়স হতে হয় কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত বছর। গাছিদের দক্ষতা ও গাছ কাটার ওপরও রস সংগ্রহ অনেকটা নির্ভর করে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি গাছ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করতে হয়। গাছ পরিষ্কার করার পর পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন গাছ কাটতে হয়, যাতে গাছে রস তৈরি হওয়া শুরু হয়। কোনো কোনো গাছ কাটা শুরুর তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই রস পাওয়া যায়। এরপর কাটা অংশের যেখানে রস গড়িয়ে পড়ে সেখানে নল বসাতে হয়। নল হলো চিকন বাঁশের কাঠি। এই নলের আধা ইঞ্চি পরিমাণ গাছে ঢুকিয়ে দিতে হয়। নলের মধ্য দিয়ে রস ফোঁটায় ফোঁটায় গাছের ঝুলন্ত হাড়িতে জমতে থাকে। তবে গাছ একবার কাটলে তিন থেকে

চারদিন রস সংগ্রহ করা যায়। এরপর পরবর্তী দুই থেকে তিনদিন গাছ শুকাতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে গাছ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

রস সংগ্রহের পর প্রতিবার হাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকাতে হয়। এতে সংগৃহীত রস গাজানো বন্ধ থাকে। নারীরা রস ঘরে এলেই বসে যায় গুড় জ্বাল দিতে। উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত খেজুরের গুড় তৈরির জন্য রস জ্বাল দিতে হয় খুব সাবধানে। রস সংগ্রহের পর পরিস্কার কাপড় দিয়ে রস ছেকে চুলায় জ্বালে বসায়। চুলার উপর বসানো লোহার বা স্টিলের কড়াইয়ে রস ঢালা হয়। চুলার উপর কড়াই বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হয়, যাতে কড়াই ও চুলার মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা না থাকে। আরও খেয়াল রাখতে হয় যেন ধোঁয়া কড়াইয়ের রসের সাথে মিশতে না পারে। প্রথম অবস্থায় রসের উপরে যে গাদ ভেসে উঠে তা দ্রুত তুলে ফেলতে হয়। ছাকনি বা হাতা দিয়ে এটা তুলে ফেলে দিতে হয়।

তারপর রস ঘন হলে দেখতে হয়, সেটা গুড় হবার উপযোগী হয়েছে কিনা। এজন্য ঘন রস হাতা দিয়ে অল্প তুলে ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলে দেখতে হয়। ফোঁটার আঠালো ভাব দেখা গেলে বোঝা যায় এটা গুড় হবার জন্য প্রস্তুত। এরপর কড়াইয়ের ফুটন্ত রস হাতলের সাহায্যে লাগাতার নাড়তে হয়। পাশাপাশি চুলার তাপমাত্রা দ্রুত কমিয়ে আনতে হয়। রস গুড় তৈরির জন্য উপযুক্ত হয়েছে কিনা জানতে, এক চিমটি পরিমাণ গুড় ঠাণ্ডা পানিতে ছেড়ে দিতে হয়। গুড় দ্রুত জমাটবদ্ধ হলে বুঝতে হবে গুড় চুলা থেকে নামানোর উপযোগী হয়ে গেছে। চুলা থেকে কড়াই নামিয়ে দ্রুত ঠাণ্ডা

খেজুর রস বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন একজন গাছি

করতে হয়। অর্ধ তরল প্রকৃতির গুড় সচরাচর মাটির বড় বড় পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। মাটির পাত্রে গুড় সংরক্ষণে তুলনামূলকভাবে খরচ কম। তাই অধিকাংশ গুড় ব্যবসায়ী মাটির পাত্রে গুড় সংরক্ষণ করে থাকেন। অনেক সময় পাখি খেজুরের হাড়িতে বা রসের নলে বসে রস খায়। পাখির মাধ্যমে যাতে কোনো রোগ জীবাণু ছড়াতে না পারে সে খেয়াল রাখা দরকার। এজন্য গাছে হাড়ি ঝুলানোর সময় হাড়ির মুখ জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

'বেতাল পাড়া' গ্রামের আহম্মদ আলী জানান, তিনি বিগত ত্রিশ বছর ধরে এই পেশার সাথে যুক্ত আছেন। শীতের তীব্রতা যত বেশি হয়, খেজুর গাছে রস তত বৃদ্ধি পায়। আহম্মদ আলী প্রতিদিন রস ও গুড় বাজারে বিক্রি করেন। এ দিয়েই তার দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ ও ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালান তিনি। রস ও খেজুরের গুড় বিক্রয় করে আহম্মদ আলীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। বাজারে এখন ১২০/১৩০ টাকা দরে বিক্রি হয় খেজুরের গুড়।

মো: আসলাম উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফইডি, যশোর এরিয়া

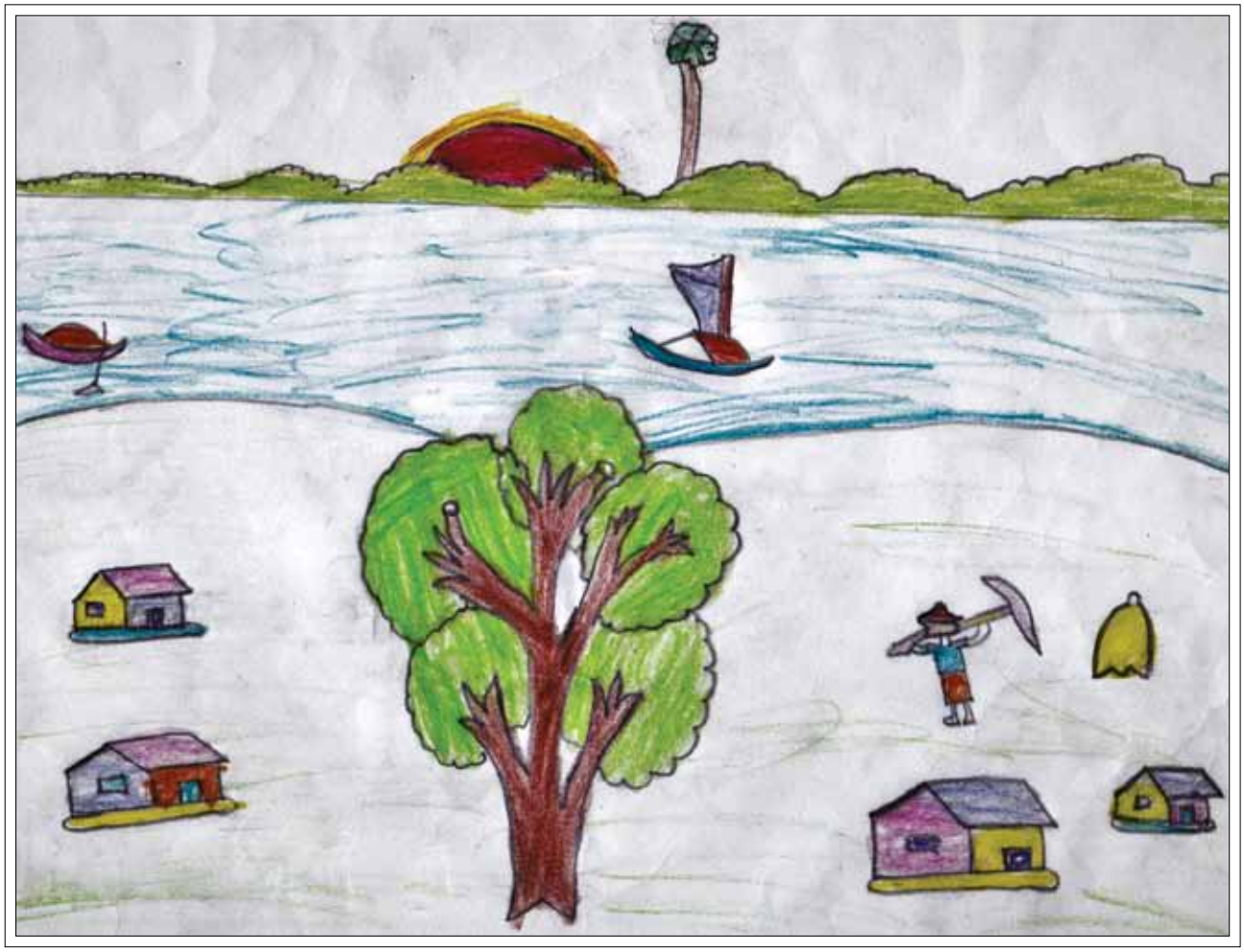

ছবিটি এঁকেছে: সুমি, দ্বিতীয় শ্রেণি, রামচন্দ্রদী সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র-২০
মাতার নাম: মোছা: রহিমা বেগম, *দলের নাম:* রুপসী/৪৪

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission